সাভার ট্র্যাজেডি

সাংসদের মেয়ের জামাই ...খুন মাফ

লিখেছেন **খন্দকার তাজউদ্দিন**

ধসে পড়া ভবনের ভেতর থেকে আর কাউকে জীবিত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছে উদ্ধারকর্মীরা। সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ও স্কাউট কর্মীরা উদ্ধার চালাচ্ছেন। দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো একে অপরের ওপর দায়ভার চাপাতেই এখন ব্যস্ত। রাজউক, পূর্ত মন্ত্রণালয় বিজিএমইএ কর্মকর্তারা বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

পূর্তমন্ত্রী বলেছেন, ওই ভবন নির্মাণে কোনো ধরনের অনুমতি নেয়া হয়নি, অন্যদিকে গার্মেন্টস মালিক অজ্ঞাত স্থান থেকে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছেন, নিয়ম মেনে খ্যাতনামা প্রকৌশলীদের দিয়ে ভবনটি তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে কার কথা সত্য?

ওই জমির মালিকানা নিয়েও সমস্যা রয়েছে। গার্মেন্টস মালিক অবৈধভাবে সরকারি খাস জমির মালিকানা নিয়েছেন। জানা গেছে, স্পেকট্রাম স্যুয়েটারের কারখানা হিসেবে রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত নেই। এই গার্মেন্টসের মালিক শাহরিয়ার সাইদের শ্বশুর হচ্ছেন অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান এমপি। তিনি জাতীয় সংসদে ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে বলেছেন, 'সম্পূর্ণ অবৈধ পন্থায় অপরিকল্পিতভাবে ৯ তলা বিশিষ্ট গার্মেন্টস ভবনটি নির্মাণ করা হয়। অনুমোদনহীন নকশা ও পরিকল্পনার ওপর তুলনামূলক দুর্বল ভিত্তিতে নির্মাণ হওয়ার কারণেই ভবনটি ধসে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে'। প্রশ্ন উঠেছে তাহলে পূর্ত মন্ত্রণালয় এতোদিন বিষয়টি কেন দেখেনি!

শাহরিয়ার ফেব্রিক্স ও স্পেকট্রাম স্যুয়েটার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে পূর্তমন্ত্রীর এ বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করছেন। রাজউকের নির্বাহী প্রকৌশল রিয়াজুল মনীর সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, ক্যান্টনমেন্ট চ্যাপ্টার্ড এরিয়ার সংশ্লিষ্ট বোর্ড দপ্তর থেকে ভবন নির্মাণের অনুমোদন নেয়া হলেও রাজউক থেকে 'সম্মতি অনুমোদন' নেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রাজউক সমগ্র রাজধানী ও সম্প্রসারিত ঢাকার সব অবকাঠামোর পরিকল্পনা নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ কার্যাদি তত্ত্বাবধান করে থাকে। সে ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বিষয়ক গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরীণ ভবন ও অবকাঠামোগুলোর জন্য রাজউকের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা নেই; কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট চ্যাপ্টার্ড এরিয়া বা অন্য কোনো সংরক্ষিত এলাকার পরিকল্পনা ও নকশা নির্মাণের আগেই অনুমোদন করিয়ে নেয়া বাধ্যতামূলক। রাজউকের চেয়ারম্যান ভবন ধসের দায়ভার নিতে রাজি নন।

ভবন ধসের মাধ্যমে যে বিপর্যয় নেমে আসল তার জন্য আসলে দায়ী কে? সাভার ট্রাজেডির দায়িত্ব কেউ স্বীকার করছে না। সরকার বা মালিক পক্ষ কেউ নিজেদের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করছে না। ঘটনার পর হতে মালিকপক্ষ পলাতক রয়েছে। সরকার দলীয় প্রভাবশালী এমপির অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমানের জামাই হবার সুবাদে পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে না। ট্রাজেডির এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশি কোনো তৎপরতা নেই।

ঢাকা জেলা প্রশাসন, সাভার উপজেলা ভূমি কার্যালয় ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, স্পেকট্রাম স্যুয়েটার কারখানার ভবনটি শুধু প্রবহমান খাল-নালা-জলাধার আটকে দিয়েই গড়ে ওঠেনি, সেখানে বহুতল ইমারতটি বানাতে ২২ ফুট প্রশস্ত সরকারি রাস্তার পুরোটাও দখল করে নেয়া হয়েছে। সরজমিনে গিয়ে জানা গেছে, সাভারের পলাশবাড়ি মৌজায় এসএ খতিয়ান অনুযায়ী সরকারি হালোট (রাস্তা) এবং বাইপাইল ব্রিজের নিচ দিয়ে প্রবাহিত খালের বেদখলের অভিযোগ তুলে এলাকাবাসী ১৯৯৫ সালে একটি অভিযোগ দাখিল করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মোঃ আবুল হোসেন, গুলবাহাদুর, সাবেক ইউপি সদস্য দেলোয়ার

হোসেনসহ বেশ ক'জনের সইকৃত অভিযোগটি তদন্তের জন্য সাভার উপজেলা ভূমি কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থল ও আশপাশের বাসিন্দাদের সূত্রে জানা যায়, ডেন্ডাবর টেকপাড়ার বাসিন্দা জনৈক সৈয়দ আলীর কাছ থেকে পলাশবাড়িস্থ ২০০ নম্বর দাগভুক্ত সাড়ে ৪ বিঘা জমি শাহরিয়ার সাইদসহ তার পার্টনাররা ক্রয় করে। দলিলপত্রেও সৈয়দ আলীর জমিকে পানিভর্তি খাল-নালা বলে উল্লেখ করা হলেও সীমানা নির্ধারণের সময় কারখানা মালিকরা সরকারি উঁচু রাস্তা ও খাস জমির জায়গাসহ ঘেরাও দিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন। এ নিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে দফায় দফায় বিরোধ হলেও শাহরিয়ার সাঈদ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

শ্রম মন্ত্রণালয় আওতাভুক্ত তদন্ত দলের কর্মকর্তারা বলেছেন, ৪ বছর ধরে চালু হওয়া স্পেকট্রাম স্যুয়েটার লিমিটেড সরকারিভাবে কল-কারখানা রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। কারখানা আইন ৮-এর ৩ ও ৪ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি কল-কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রম মন্ত্রণালয়ের রেজিস্ট্রেশন করাটা বাধ্যতামূলক। কেউ তা অমান্য করলে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন দপ্তর থেকে মামলা দায়ের, কারখানা কর্মকান্ড বন্ধ করে দেয়া এবং জরিমানা আদায়সহ রেজিঃ গ্রহণ বাধ্য করার বিধান রয়েছে। কিন্তু মালিক পক্ষের প্রভাব প্রতিপত্তি থাকায় স্পেকট্রাম স্যুয়েটার লিমিটেডের ক্ষেত্রে এসব বিধান প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়নি। বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে সাভার গার্মেন্টস ট্রাজেডি তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিজিএমইএ'র চেয়ারম্যান আনিসুল হক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'বিধ্বস্ত সাভার গার্মেন্টসের মালিক বিজিএমইএ'র সদস্য। পুরো বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখেছি। শিগগিরই তদন্ত রিপোর্টের কাজ শেষ হবে। তিনি বলেন, আহত-নিহতদের জন্য বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সাহায্য করার চেষ্টা করা হবে।

নির্মাণ ত্রুটির কারণে বিধ্বস্ত তৈরি পোশাক কারখানা স্পেকট্রাম স্যুয়েটার লিমিটেডের মালিক শাহরিয়ার সাইদ ও পরিচালক হাশেম ফকিরের বিরুদ্ধে 'খুন নয় এমন অপরাধজনক প্রাণহানির' অভিযোগে মামলা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর গত মঙ্গলবার সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি করেন। পুলিশের পাশাপাশি রাজউক কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছে। সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, গত ১১ এপ্রিল রাতে স্পেকট্রাম স্যুয়েটার লিমিটেড বিধ্বস্ত হওয়ার পর ওই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয় (ডায়েরি নম্বর ৬০৬ তারিখ ১১-০৪-০৫)। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মঙ্গলবার করা হয় মামলা (মামলা নম্বর ৪৮, তারিখ ১২-০৪-০৫ ধারা ৩০৪(ক)/৩৩৮ দন্ডবিধি)। থানায় দায়ের করা মামলায় ১২টি মৃতদেহ ও ৮০-৯০ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধারের কথা উল্লেখ করা হয়। একই ঘটনায় রাজউকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আমান উল্লাহ থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। তিনি ডায়রিতে উল্লেখ করেন রাজউকের অনুমোদন ছাড়াই এই ভবনটি নির্মিত হয়।

টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে গার্মেন্টসের পরিচালক হাশেম ফকির সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, তাদের ভবন নির্মাণে কোনো ত্রুটি ছিল না। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ম মেনেই তারা সেখানে কারখানা স্থাপন করেন।

ধসে পড়া গার্মেন্টস মালিক শাহরিয়ার সাইদ ও পরিচালক আবুল হাশেম গত এক সপ্তাহে একবারও ঘটনাস্থলে যাননি। সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান শাহরিয়ার সাইদ ও পরিচালক আবুল হাশেমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, এ দু'জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলেও তাদের ঠিকানা উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। এ কারণে কোনো অভিযান পরিচালনাও সম্ভব হচ্ছে না। গার্মেন্টস ধসে নিহত ও আহতের স্বজনরা বলছেন, সরকার দলীয় একজন প্রভাবশালী নেতার মেয়ের জামাই হওয়ার কারণেই পুলিশ শাহরিয়ার সাইদ ও আবুল হাশেমকে খুঁজে পাচ্ছে না। মালিক পক্ষকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। থানায় দায়ের করা মামলায় আসামিদের ঠিকানা উল্লেখ করা নেই। গার্মেন্টসের প্রধান কার্যালয় বারিধারা ১৪ নং রোড, ৪কে ব্লক, ২ নম্বর বাসা পুলিশ জেনেও মামলায় উল্লেখ করেনি। এ ব্যাপারে সাভার থানা পুলিশ সদুত্তর দিতে পারেনি।

গত ১৭ এপ্রিল দুপুর ৩টার সময় এ কার্যালয়ের রিসিপশন রুমে ২০-২২ জন যুবককে দেখা যায়। মিজানুর রহমানের নামে এক গার্ড জানান, নিচতলায় ৫টি রুমে জেনারেল ম্যানেজার, ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, প্রধান হিসাব রক্ষক ও লিয়াজোঁ অফিসারসহ অন্যান্যরা বসেন। দোতলায় উঠলে বাম পাশের রুম দেখিয়ে মিজানুর রহমান জানান, এখানেই মালিকপক্ষ বসেন। পরে ভাগ্নে পরিচয় দেয়া যুবক মনির হোসেন এগিয়ে এসে বলেন, দুর্ঘটনার পর থেকে মামা কোথায় গেছেন, কোথায় আছেন তা মামী পর্যন্ত জানে না। মামার কন্ট্রাক্ট নাম্বার চাইলে দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

দেশে অপঘাতে প্রতিদিন মরছে মানুষ। লঞ্চডুবিতে লাশ ভেসে যাচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে হরহামেশাই। বোমা ও গ্রেনেড হামলায় ঝলসে যাচ্ছে মানুষের দেহ। সাভারের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা জাতিকে হতবাক করে দিয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করেও এখনো মৃত লাশগুলো উদ্ধার করতে পারেনি।

...মৃত্যুর সংখ্যাটাই খবর

লিখেছেন **শাকিল আহমেদ**

১. মাঝে মাঝেই মনে হয়, যদি হুট করে আমি নিজেই মরে যাই!... বড় জোর সিঙ্গেল কলাম। পরদিন কোনো দৈনিকে। আমার সহকর্মীরা অনেকখানি কষ্টও হয়তো পাবেন। তবে লাশের ছবি তুলতে নিউজরুমে ক্যামেরা না থাকার সংকটে পড়বেন আমার প্রিয় সম্পাদক। তার তাড়ায় অবশেষে চায়ে শেষ চুমুকটা দিয়েই হয়তো দৌড়াবেন একসময়ের সহকর্মী রিপোর্টার। লিড কামিংআপ আর অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া-নেয়া নিয়ে আরও একটি অসম্ভব ব্যস্ত দিন কেটে যাবে বাকি সবার।

এ পর্যন্ত আমি ভাবতে পারি।

কিন্তু আমার মৃত্যুভাবনার চতুর্দশ সীমানার কাছেও ভেড়াতে চাই না মায়ের মুখ। আমি চাই না এমনকি এ লেখাটিও তিনি পড়ুক। আহা! আর আমার প্রিয়জন, সঙ্গিনী?

আমার কাল্পনিক মৃত্যুতে ওদের শোকের ভাষা আমার বোধ অতিক্রম করে। আমি ভাবতে পারি না।

মাথার ওপর নিশ্চিত আশ্রয় যে ছাদ, সেই ছাদ মাথার ওপরই ভেঙে পড়ে যে শ্রমিকেরা মারা যায়, তাদের হতবিহবল চেহারা বহুগুণ ছাপিয়ে বাজে তাদের প্রিয়জনের মুখ।

সহজে বুঝতে পারি, ওই বেদনা আমার মায়ের বেদনার চেয়ে কেন কম হবে? তবু ওই বেদনা আমি বইতে পারি না। আমি বুঝে নেই এতগুলো মানুষের কষ্টকর মৃত্যুর খবর, তাদের স্বজনের শেষ পরিণতি আলাদা আলাদা করে প্রচার করার ক্ষমতা আমার দুই মিনিটের টিভি নিউজে নেই। অনেক মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় এজন্যই বেছে নেই একজন বা দুজন 'হিউম্যান এক্সাম্পল'। তার কান্নার আওয়াজ থেমে যাওয়ার আগে ক্যামেরাম্যানকে ইশারায় বলি দ্রুত ছবি তুলতে।

এসব নিষ্ঠুর অনুভূতি ছাপিয়ে দেশে সাংবাদিকতার দৌড়ে আরও একটি সত্য আমি বুঝে ফেলি, ১ জন সাধারণ মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু এখন আর খবর নয়, মৃত্যুর সংখ্যাটাই খবর। আবার সাধারণ মানুষের অনেক অস্বাভাবিক মৃত্যুও জাতীয় শোক দিবস পালনের জন্যে যথেষ্ট নয়, যদি না মৃত্যুর সংখ্যাটি কোনো সামরিক, রাজনীতিবিদ অথবা তেমনই কারো হয়!

অনেক অনেক মৃত্যু দেখে দেখে ইদানীং এসব অনুভূতি কেবল সামনে চলে আসে।

২. এটিএন বাংলার খবর বিভাগের রুটিন অনুযায়ী সপ্তাহে একদিন রাতের ডিউটি আমাদের। সাভার ট্র্যাজেডির দ্বিতীয় দিন পার হয়ে তৃতীয় রাত পড়েছে। ওই ঘটনায় প্রথমবার আমাকে পাঠানো হয়েছে। দোতলা সমান একটি সিঁড়িঘর পেরিয়ে সামনে এগোতেই আরেকটা ভবনের অমসৃণ ছাদ। জানা গেল, ৯ম তলার ছাদ সেটি। ৯টি তলাই একটার ওপর আরেকটা পড়ে আছে। ছাদের ৭ম ও ৪র্থ তলায় তখনো চাপা পড়ে আছে শতাধিক মানুষ। জীবিত অথবা মৃত। অসংখ্য উদ্ধারকর্মী সেই ছাদ টুকরো টুকরো করে কাটার চেষ্টা করছেন। সেখানে কাটা অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে হতভাগ্য মানুষের লাশের তীব্র গন্ধ। বেঁচে থাকা আর না থাকার পার্থক্য প্রকটভাবে ধরা দেয় তখন। ওই গন্ধের সূত্র ধরেই আমরা পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগে ফায়ার ব্রিগেডের এক কর্মী কাটা ছাদের এক অংশ দিয়ে চাপা পড়া দুই ছাদের তলায় ঢুকে পড়েছিলেন। কোনোমতে হাতড়ে বের করে এনেছেন দুটি লাশ। দূরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছেন আরও দুটি মৃতদেহ। তবে দুদিনের চাপা পড়া মৃতদেহের গন্ধ সয়ে খুব বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি তিনি।

আমার মনে পড়ে, এমন তীব্র অথচ বেদনাকর মরা মানুষের গন্ধ আমি আরও একবার পেয়েছি কমাস আগে। ইন্দোনেশিয়ায়। বান্দা আচেহ শহরজুড়ে।

সুনামির আঘাতে শহরে যতদূর চোখ যায়, কেবল ধ্বংসস্তূপ। আমরা পৌঁছেছিলাম সুনামির অন্তত ১৭ দিন পর। এরপরও ১০ হাত পরপর ধসে পড়া দেয়ালের তলায় মানুষের লাশ। শত শত। বেঁচে থাকা সৌভাগ্যবান একজন বলছিলেন, তার মায়ের লাশ পাওয়া গেছে ৬ কিলোমিটার দূরে। আমরা যেখানে দাঁড়ানো তার পাশেই ধ্বংসের নিচে ভাইয়ের লাশ। খুব চেনা পাশের বাড়ির ছোট মেয়েটারও একই পরিণতি। তবে উদ্ধারের উপায় নেই। তাদের বের করতে হলে পুরো বাড়ি আগে ভাঙতে হবে। সমস্যা হচ্ছে, এরকম কয়টা বাড়ি ভাঙা সম্ভব। আমি তারও প্রায় ১০ দিন পর দেশে ফিরে খবর পেয়েছিলাম, ধ্বংসস্তূপের নিচে ওরকম আটকা পড়া লাশের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যদিও ১৫ হাজার ইন্দোনেশিয়ান সেনা দিনরাত কাজ করেছে। সারা দুনিয়া থেকে গিয়েছিল উদ্ধার কর্মীরা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উদ্ধার তৎপরতাও ছিল সেটি।

এখানে একটি ঘটনায় ধসে যাওয়া বাড়ি সরাতে দিনরাত কয়েকটি শিফটে ভাগ করে কাজ করছে অন্তত পাঁচশ'র মতো সেনা, ফায়ার ব্রিগেডের আরও শ' খানেক কর্মী। এতে যোগ দিয়েছে সাধারণ মানুষও। এক কর্মকর্তা বলছিলেন, ভবন সরিয়ে মানুষ বের করতে যথেষ্ট যন্ত্রপাতিও নাকি তাদের আছে। তবে মুশকিল হচ্ছে, জীবিত কেউ তখনো থাকতে পারে কোনো এক অজানা তলায়, অজানা স্থানে। এছাড়া তারা বলতে চাচ্ছিলেন, মৃতদেহ তারা বের করতে চান, যতটা সম্ভব অক্ষতভাবে। ফলে বুলডোজার দিয়েও গুঁড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। এরপরও জীবিত কেউ সত্যিই যদি থাকে, তার জন্যও তো যথা শিগগির ধ্বংস পাহাড় সরানো দরকার। তাই প্রশ্ন ছিল, তাহলে কবে নাগাদ শেষ হচ্ছে উদ্ধারকাজ? নিশ্চিত কোনো উত্তর ঠিক ওই মুহূর্তে ওই কর্মকর্তা দিতে পারেননি। আমি যে রাতে পৌঁছেছি, তখনো ছাদের ওপর থেকে মূল যে অংশে আটকা পড়েছে অধিকাংশ মানুষ তার মধ্যে ৯ম তলা থেকে মাত্র ৮ম তলা পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলেন তারা। আমার সঙ্গী ক্যামেরাম্যান লিটু বলছিলেন, ঢাকায় একটা ছোটখাটো ভূমিকম্পও যদি হয়, কি হবে আমাদের সবার? (এ লেখা যখন লিখছি, অর্থাৎ এক সপ্তাহ পরেও উদ্ধার তৎপরতা শেষ হয়নি।)

ভোররাতের দিকে আমরা যখন কাজ প্রায় শেষ করে ফিরছি, সেখানে কর্মরত এক আনসার সদস্য দৌড়ে এলেন। 'ভাই এত লোকের খবর নিলেন, আমাদেরটা তো নিলেন না।' কিছু বলার আগেই তিনি জানালেন, ওই গার্মেন্টসে দায়িত্ব পালনরত এক আনসার সদস্য প্রায় ২৪ ঘন্টা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আটকা থেকে গতকাল বিকেলে বেরিয়ে এসেছেন। কিভাবে? তার মানে ওখানে এখনো এমন জায়গা আছে যেখানে বেঁচে থাকা সম্ভব! খুব ইচ্ছা হলো ওই আনসার সদস্যের সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জীবন ফিরে পেয়ে প্রিয়জনদের কাছে ছুটে গেছেন। বেঁচে থাকার আনন্দ তার প্রাণভরেই নেয়া উচিত। তবে আমাকে অবাক করে দিয়ে চটপটে আনসার জানালেন মোতালেব নামের প্রাণ ফিরে পাওয়া ওই আনসার এখানেই আছেন। ধসে পড়া গার্মেন্টসের ডানদিকে খোলা একটা মাঠ মতন জায়গায় ছোট একটা চাদর টানানো হয়েছে। তার নিচে সার দিয়ে ঘুমিয়ে আছে ক্লান্ত কিছু লোক। আমাদের দেখেই পাশে দাঁড়ানো এক সেনা ঘুমন্তদের উদ্দেশে কড়া ধমক লাগালেন। ভোর হয়ে গেল, এখনো উঠছে না -এ জাতীয় কিছু একটা বললেন তিনি। তার মধ্যে থেকেই চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে এলেন মোতালেব। ওই মুহূর্তে তার সাক্ষাৎকার চাওয়াও খুব অমানবিক মনে হলো। কিন্তু বড় সাংবাদিক সামনে দাঁড়ানো। সহকর্মীদের চাপেই গড়গড় করে বলে গেলেন, 'ওইখানে আমার পাশে আরও একটা লোক ছিল, সে আমারে দেখে না, আমিও তারে দেখি না। ঘুটঘুটে আন্ধার। তার কান্দন আমি শুনি, আমার কান্দন সে। কিন্তু বাইরের দুনিয়ার লোক শোনে না। আবার দম বন্ধ হয়া আসে। তার কতক্ষণ পর জানি না, দিন আর ফুরায় না, হঠাৎ দেখি সূর্যের আলো আসতাছে। একখান টেবিল না কি সরায়ে হাতড়ায়ে বাহির হইয়া আইলাম.....।' সহজ অথচ বিষণ্ন উত্তর।

কিন্তু আমার মাথায় ভিন্ন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। 'আপনি এখনো এইখানে কি করতাছেন?'

'না মানে', মোতালেব দ্রুত বলতে চাইলেন, 'আমার তো কিছু হয় নাই, চাকরিতে লাইগা গেলাম।'

এইবার আমার অবাক হওয়ার পালা। বলে কি এই লোক! মরে গেলে এই চাকরি কে করত! তাকে কি ছুটি দেয়া হয়নি? নাকি দিনচুক্তির নিয়োগ তার। এত প্রশ্ন করার সুযোগ আমার হলো না। ক্যামেরাম্যান তাড়া দিলেন, ৭টায় নিউজ ধরাতে হবে। শুধু মনে হলো, দেশে কারো কারো জন্যে জীবন, মৃত্যুর চেয়েও কঠিন। ভোররাতে আমাকেও ছুটতে হলো রাজধানীর দিকে।

লাশের জন্যে অপেক্ষা...

লিখেছেন **ফারজানা রূপা**

সাভারে যাওয়ার আগে যে ধারণা পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে একটা কল্পনাও ছিল যে নয়তলা ভবনটা বুঝি একপাশে হেলে পড়েছে, ভেঙে পড়েছে। কিন্তু নয়তলা যে একতলা সমান হয়ে যেতে পারে এ দৃশ্য সামনে দাঁড়িয়ে না দেখলে বোঝার উপায় নেই। প্রথম দেখেই হ্যামবার্গারের একটা চেহারা মনে পড়লো। সবাই যদিও বলাবলি করছিলো ৫০০ শ্রমিক আটকা পড়েছে, তা ভাবতে একেবারেই সায় মিলছিল না মনে! এখন ভাবনা আরো ভয়াবহ হলো, যখন লিফট বা সিঁড়ি না বেয়ে শুধু ভাঙা পাইলিংয়ের ওপর পা রেখে একতলা সমান নয়তলার ওপর উঠলাম। ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা তখন ধ্বংসস্তূপের ভেতর আটকেপড়া এক শ্রমিককে উদ্ধারের প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছিল। হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে বুঝবার উপায় ছিল না যে, বুক আর মাথাকে যুক্ত করে আছে যে ঘাড় তার ওপর চেপে বসেছে বিশাল এক কংক্রিটের স্তূপ। হাত-পা সবই নাড়তে পারছিলেন এভাবে আটকে থাকা ৪২ বছরের নজরুল। নজরুলের ঘাড়ের ওপর থেকে স্তূপ সরাতে লেগেছিল টানা ৫ ঘন্টা। ড্রিল মেশিন দিয়ে প্রথমে ইট, বালুর আবরণ এমনভাবে কাটা হয় যেন তা ভেদ করে আবার শরীরে না ঢুকে যায়। একই পদ্ধতিতে শরীর বাঁচিয়ে কাটা হয় প্রতিটি রড। একটু আগেই সবাই যে বলাবলি করছিলো, কম সুতার রড দিয়ে ভবনটি বানানো হয়েছে, আমার মনে হলো এ যেন শাপে বর হয়েছে আটকে পড়াদের জন্য, তা না হলে আরো মোটা রড কেটে হয়তো নজরুল ইসলামকে বাঁচানো যেতো না। যেমন করে বাঁচানো যায়নি আলেয়াকে। সাততলায় অন্য নারী শ্রমিকদের সঙ্গে সরাতে আলেয়াও আটকা পড়েন। প্রথম দু'দিন থেকে থেকে শোনা যাচ্ছিল আলেয়ার চিৎকার, বাঁচার আর্তনাদ, 'আমার শইল্যে কিছু পড়ে নাই। কোনু আঘাতও পাই নাই, আমারে খালি টাইন্যা বাইর করেন, আমার বাড়িত খবর দেন। আমার নতুন বিয়া হইছে।' না, নতুন বিয়ে করা স্বামীর কাছে আলেয়া বেঁচে ফিরতে পারেনি। তিন দিন একটি একটি করে ইট, বালু সরিয়ে উদ্ধারকারীরা যখন সাত তলার ঐ অংশে পৌঁছান, তার অনেক আগেই আলেয়া আকুতি জানানোর উর্ধ্বে চলে গেছে। তার নিচেই পূর্বীদের বের হয়ে থাকা ভাঙা অংশে দুই দিন ঝুলে ছিল অচেনা দুই যুবকের লাশ। হলুদ শার্টের সেই যুবকের পকেটে পাওয়া গেছে তার প্রেমিকা বা বোনের ছবি।

দুর্ঘটনার তিন দিন পর্যন্ত ভাঙা স্তূপের ভেতর থেকে এমনি আর্তনাদ বা লাশের আভাস পেয়ে চলছিল উদ্ধারকারী ফায়ার ব্রিগেড, সেনাবাহিনীর তৎপরতা। ৩৬ ঘন্টার মাথায় বাইরের কোনো সাহায্য ছাড়াই নিজ চেষ্টায় একতলার নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মুন্সিগঞ্জের ছেলে পলাশ। বয়স ৩২। টকটকে ফর্সা ঐ যুবকের বেঁচে থাকার ক্ষমতা দেখে মনে হয়েছিল শ্রমিকদের কঠিন হাত, হাঁটুরে পা গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য এক তলার

ওপরে নয়তলার ধ্বংসস্তূপও যথেষ্ট নয়। পলাশ শাহরিয়ার গার্মেন্টেসে আট মাস আগে আড়াই হাজার টাকা বেতনে যোগ দিয়েছিল বয়লার এসিস্টেন্ট হিসেবে। দুর্ঘটনার সময় নিচতলায় রাখা আমেরিকান কোম্পানির বয়লার থেকে মাত্র পাঁচ হাত দূরে রাতের খাবারের প্রস্তুতি হিসেবে গ্লাসে পানি ঢালছিল সে। এই প্রতিবেদককে সে বলে, পানিটা খাওয়ার আগেই দেখি ওপর থেকে ঝুরঝুর করে ছাদ ভেঙে পড়ছে। আমি তখন ভাবলাম মৃত্য তো নিশ্চিত, শেষ সময়ে আল্লার নাম নেই, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা... পড়তে পড়তে ২০ মিনিট চলে গেল, গুড়ুম শব্দে যে ভেঙে পড়া শুরু হয়েছিল, তাও থেমেছে। তখন থেকে একটু একটু করে সামনে যা পড়েছে তা সরিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। ভেতরে তিন দিন না খেয়ে কেমনে বাঁচলেন? ও তিন দিন হয়েছে নাকি, আসলে আমার তো দিন-তারিখের হিসাব নাই, তখন জীবন বাঁচানোটাই টার্গেট ছিল, বললো পলাশ, ক্ষিদা টের পাই নাই। তবে, সব সময় ভয় ছিল ওপর থেকে যদি কেউ একটু চাপ দেয় তাহলেই শেষ! কারণ, আমার চারপাশে এক ইঞ্চি করে জায়গা ছিল বোধহয়! গরম টের পাননি, বয়লারের এতো কাছে ছিলেন... গরম নরমালই ছিল (নয়তলা ভবনের নিচে তিন দিন চাপা থাকা পলাশের মনে হয়েছে গরম নরমালই ছিল, যা সহজেই অনুমেয় গার্মেন্টসের শ্রমিকরা কি রকম উত্তাপের মধ্যে কাজ করে!)। আর বয়লার ফাটেনি সেটা আমি একেবারে নিশ্চিত। কারণ, বয়লার এসিস্টেন্ট হিসেবে আমি জানি, ওর মধ্যে যে আড়াই হাজার সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পানি থাকে তা ফেটে বেরিয়ে এলে যে আঁচড় লাগতো তাতে আমার ঝলসে যাওয়ার কথা! পলাশ ১২ এপ্রিল দুপুরে সাভার সম্মিলিত হাসপাতালে শুয়ে বলেছিল, তার আশপাশে সে আরো শ্রমিক, সহকর্মীর আওয়াজ শুনেছে প্রথম, দু'দিন পরে আর কিছু টের পাওয়া যায়নি।

পলাশের পাশে দু'দিন আর্তনাদ করে যারা চিরতরে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন তাদের একজন হয়তো আব্দুস সালাম। ১৮ বছরের সালামকে খুঁজতে ঘটনার দু'দিন পর মেলান্দহ থেকে তার ৪৫ বছর বয়সী মা ছুটে এসেছিলেন, তার বুক আহাজারিতে ছিল, মাসখানেক আগে শ্রমিক বাবা অন্য আরেক দুর্ঘটনায় দু'হাত পুড়ে পঙ্গু হয়ে ঘরে ফিরেছিল। চার ভাই-বোনের মধ্যে বড়, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সালাম। বই পাশে ঠেলে মাকে বলেছিল, 'তুমি ভেবো না, আমার পড়ালেখা নষ্ট কইরা ছোটগুলারে মানুষ করবো। মাস শেষে সেদিনই বেতন পেয়ে মিষ্টি হাতে বাড়ি ফেরার কথা ছিল সালামের। সাংবাদিক, দর্শনার্থী তো বটেই, যে র‍্যাব সদস্যদের ক্রসফায়ারে হাত কাঁপে না তাদের কেউ পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সালামের মা নূরজাহানের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। ঘটনার দ্বিতীয় দিনে সালাম, মুনির, জাহাঙ্গীরের মা-বাবা, স্বজনেরা এসেছিলেন সে মানুষটার খোঁজে। কিন্তু সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চেহারাও পাল্টে যায়। বাতাসে যখন লাশের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, যখন তারা চোখের সামনে দেখতে পান, সেনাবাহিনীর শক্তিশালী ক্রেনগুলো ভারী কংকিটের স্তূপ সরাতে পারছে না, তখন তারা বলে ওঠেন, 'আমার মানুষ গেছে, যাক! লাশটা দেও, বাড়িত নিয়া দাফন করি।'

যে সালামের মা সালামের জন্য আর্তনাদ করেছেন, ছেলে রোজগার করে তাকে শাড়ি কিনে দেবে বলে বিলাপ করছেন, সেই মা লাশের জন্য বুক চাপড়ে চোখের পানি আর নাকের পানি একাকার করছেন। তার চোখের সামনে মাত্র কয়েকশ' গজের মধ্যে তার প্রাণের সন্তান চাপা পড়ে আছে, হয়তো বেঁচে থেকে আহাজারি করছে, বা মরে গেছে, তাকে বের করে আনার ক্ষমতা মহা ক্ষমতাধর সেনাবাহিনী বা ক্রসফায়ারের র‍্যাবেরও নেই!

এই মানুষগুলো, অর্থাৎ কম করে হলেও যে শতাধিক শ্রমিক নিখোঁজের কথা বলা হচ্ছে, তাদের পরিবারের সদস্যরা যারা পাঁচ দিন পাঁচ রাত প্রিয়জনের লাশের অপেক্ষা করেছেন, তাদের কাছে যখন জানতে চাই, ক্ষতিপূরণ কি পাবেন, জানেন কিছু? আটকে পড়া শ্রমিক জামালপুরের আব্দুল লতিফের ভাতিজা আবুল কাশেম তখন বলে, তারা লাশটা পেলেই খুশি, এই যে পাঁচ দিন খোলা আকাশের নিচে থাকলাম, কি করলাম, কেউ জিগায়নি, তারা দেবে ক্ষতিপূরণ? পাশে বসা অপর শ্রমিকের বোন রহিমার অভিযোগ, লাশ বের হলে ছুটে যাই, চেনার চেষ্টা করি আমার ভাই কিনা, কিন্তু তারা লাশটা ভালোমতো দেখায়ও না!

এই কাহিনীর উল্টোদিকে উদ্ধারকারীদের যে চিত্র তা যেকোনো মানুষকে ভাবনার মধ্যে ফেলে দিতে পারে। প্রাকৃতিক কারণে বা শাহরিয়ার গার্মেন্টসের মালিকদের মতো দুষ্ট লোকদের কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু তাই বলে লাশ উদ্ধার করার জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা নেই এমন দৃষ্টান্ত এবার তৈরি হলো। এর আগে এরকম দুর্ঘটনার নজির থাকার পরও এটা যে অবহেলা নয়, তা যে কেউ বলতে পারে। কারণ, ১১ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ভবন টুইন টাওয়ার যখন ভেঙে পড়ে তখন সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে কতো দ্রুত, আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে জঞ্জাল সরিয়ে ফেলা সম্ভব।

অথচ ঘটনার সপ্তাহখানেক পার হতে চললো, এখনও ধ্বংসস্তূপটি দেখলে মনে হয় প্রথম দিন যেরকম ছিল ঠিক তেমনটাই আছে, কেবল ভেতরে কিছু অংশ ফাঁপা করা হয়েছে। যারা ঘন্টার পর ঘন্টা এমনকি দিন-রাত স্বজনের লাশের জন্য অপেক্ষা করছেন, তারা এখন কি নিয়ে বাড়ি ফিরবেন?

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**